بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০১ মে, ২০২০ মোতাবেক ০১ হিজরত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যারা অতি সম্প্রতি মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পেশার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, সবার ভিন্ন ভিন্ন কর্মব্যস্ততা ছিল। শিক্ষাগত যোগ্যতাও তাদের ভিন্ন ভিন্ন ছিল। কিন্তু একটি বিষয় তাদের সবার মাঝে সমান ছিল, আর তা হলো, বয়আতে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার রয়েছে তা তারা নিজেদের সাধ্যমত রক্ষা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায়– তা পালন করেছেন, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন, বান্দার প্রাপ্য প্রদান করতেন এবং তারা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর যে শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত-প্রাণ দাস'কে প্রেরণ করেছেন, তাদের মাঝে সেই শিক্ষার ব্যবহারিক চিত্র সত্যিকার অর্থে বিদ্যমান ছিল।

আমি বলেছি, তাদের মাঝে একটি বিষয়ে মিল ছিল সত্যিকার অর্থে একটি নয়, বরং বলা উচিত অনেক গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মিল ছিল। তাদের ঘটনাবলী শুনে এ বিশ্বাস জন্মে যে, এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পৃক্ত হলেই এ সকল বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়, বান্দা ও খোদার মাঝে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের রীতি শেখা যায় আর আমরা শিখিও বটে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা যে জীবন্ত– এ বিষয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর তাঁর সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার উন্নত মান অর্জিত হয়।

আমি যে কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব তাদের একজন হলেন, ইন্দোনেশিয়াস্থ আমাদের আঞ্চলিক মুবাল্লেগ জুলফিকার আহমদ দামানিক সাহেব। তিনি গত ২১ এপ্রিল তারিখে ৪২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম ১৯৭৮ সালের ২৪ মে উত্তর সুমাত্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল শেহরোল দামানিক এবং দাদার নাম ছিল শাহনুর দামানিক। মরহুমের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার দাদার মাধ্যমে, যিনি ১৯৪৪ সালে মওলানা যায়নি দেলান সাহেবের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণ করেন। জামা'তের মুবাল্লেগ মরহুম জনাব জুলফিকার সাহেব ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়াতে শিক্ষা অর্জন করেন। সে যুগে সেখানে কয়েক বছরের সংক্ষিপ্ত কোর্স হতো। এরপর ১৮ বছর বিভিন্ন জায়গায় মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয় এবং পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন এলাকায় মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী মুকাররমা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা ছাড়াও চার সন্তান যথাক্রমে জাযেব, আয়েশা, খওলা ফাতিমা এবং খায়শারা নাসিরাকে রেখে গেছেন। এরা সবাই অনূর্ধ্ব ১৫ তথা সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তানের বয়স ১৫ বছর আর সর্বকনিষ্ট সন্তানের বয়স ৮ মাস এবং এরা সবাই ওয়াক্‌ফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের স্থানীয় মুবাল্লেগ মে'রাজ দ্বীন সাহেব বর্ণনা করেন যে, জুলফিকার সাহেব খুবই সফল এবং পরিশ্রমী মুবাল্লেগ ছিলেন। যেখানেই তার পদায়ন হতো, সেখানেই তিনি তরবিয়ত, যোগাযোগ স্থাপন এবং তবলীগের কার্যক্রম অতি উত্তমভাবে সম্পাদন করতেন। মরহুম প্রত্যেকের সাথে নম্রভাবে কথা বলতেন আর সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। যখনি (কারো সাথে) সাক্ষাৎ হতো, সদা হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন। কখনো কোন চাহিদা বা দাবিদাওয়া পেশ করতেন না, বরং সর্বদা দোয়ার প্রতি জোর দিতেন। আর এ বৈশিষ্ট্যই একজন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর মূল চেতনা ও প্রেরণা, যা তার মাঝে থাকা উচিত। অর্থাৎ যদি কিছু চাইতে হয় তাহলে সর্বদা খোদার কাছে চাওয়া উচিত আর কখনো কোন চাহিদা বা দাবিদাওয়া পেশ করা উচিত নয়। এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য, সকল ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর উচিত এই বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করা। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি সেসব মুবাল্লেগদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের ব্যাপকহারে বয়আত করানোর সৌভাগ্য হয়েছে আর এ কারণে ২০১৮ সনে জামা'তী ব্যবস্থাপনার অধীনে তার এখানে জলসায় আসারও সুযোগ হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে তিনি সবর্দা সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করতেন যার ফলে তিনি সর্বত্র সাফল্য পেতেন। একইভাবে আমাদের মুরব্বী সিলসিলা আসেফ মুঈন সাহেব তার গুণাবলীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান, নিষ্ঠাবান ও অনুগত একজন মানুষ ছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন, অসুস্থাবস্থায়ও জামা'তের কাজকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি বলেন, মরহুম যখন রিয়াও অঞ্চলের আঞ্চলিক মুবাল্লেগ হিসেবে কাজ করছিলেন তখন তার অধীনে আমার (আসিফ সাহেবের) কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি উত্তম নেতাসুলভ দক্ষতার ভিত্তিতে কাজ করাতেন। সরকার ও প্রাদেশিক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে তার ভালো যোগাযোগ ছিল, এর ফলে বেশ কয়েকবার তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেয়ারও সুযোগ পান। এছাড়া প্রদেশে লস্ট জেনারেশন এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদেরকে জামা'ত সম্পর্কে অবগত করেছেন এবং গোটা প্রদেশে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখেন। একটি স্থানীয় জামা'ত স্যাংগিগী-কে প্রায় ২০ বছর পর পুনঃপ্রতিষ্ঠার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। যাদেরকে লস্ট জেনারেশন বলা হয় তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য তাকে নৌকা যোগে ছোট ছোট দ্বীপে যেতে হতো আর এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপে যেতে দেড়-দুই ঘন্টার সফর করতে হতো। তিনি অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সাহস করতেন এবং বলতেন, যতক্ষণ আমার মাঝে সেবা করার শক্তি আছে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কাজ করে যাব। এসব সফরের কল্যাণে চারটি পরিবার জামাতভুক্ত হয়। ডায়লাসিসের জন্য তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। এই অবস্থায়ও তিনি একটি স্থানীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সেখানকার এক খাদেম তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেন এত কষ্ট করলেন? উত্তরে তিনি তাকে বলেন, যতদিন আমার দেহে প্রাণ আছে আমি জামা'তের সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রণের চেষ্টা করে যাব। যদিও আমি অসুস্থ, কিন্তু আমার বাসনা হলো, সর্বদা ধর্মসেবায় লেগে থাকা। এই হলো একজন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর চেতনা ও প্রেরণা, যা তার মাঝে থাকা উচিত। কিছু লোক সামান্য সামান্য বিষয়ে যেভাবে উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত হয়ে পড়ে– তা হওয়া উচিত নয়।

অনুরূপভাবে সেখানকার মুরব্বী মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব লিখেন, তার সাথে আমার জামেয়াতে পড়ালেখা করার সুযোগ হয়েছে এবং কাদিয়ানে শেষবারের মতো তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। অর্থাৎ সম্ভবত এ বছর তার সাথে তিনি কাদিয়ান গিয়েছিলেন। কাদিয়ান

যাওয়ার পূর্বে মরহুম যখন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন তখন এ দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! এতটুকু আয়ু দাও যাতে আমি কাদিয়ান যেতে পারি। তিনি বলতেন, ওমরাহ্ করার সৌভাগ্য আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন আর যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাতেরও সুযোগ হয়েছে, এখন শুধু কাদিয়ান দেখার বাসনা অপূর্ণ রয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় কৃপায় তার এ আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করেছেন আর তাঁর কাদিয়ান দেখার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। এ বছর যদিও জলসা অনুষ্ঠিত হয় নি, কিন্তু (জলসা সম্পর্কিত) নিষেধাজ্ঞা পৌঁছার পূর্বেই তারা সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এভাবে তার সেখানে স্বাধীনভাবে ইবাদত করারও সুযোগ হয়েছে। এই মুরব্বী সাহেব আরো লিখেন, কাদিয়ানে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া এবং প্রচণ্ড শীতের কারণে তার স্বাস্থ্যের বেশ অবনতি ঘটে, যার ফলে তাকে শীঘ্র ইন্দোনেশিয়া ফিরে যেতে হয়। কিন্তু এই ভঙ্গুর পরিস্থিতিতেও তার পুণ্যবাসনা পূর্ণ হয় আর তিনি বায়তুদ্ দোয়া এবং মসজিদে মোবারকে নামায পড়ার ও দোয়া করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে বেহেশতি মাকবেরায় যিয়ারতের জন্য নিয়ে গিয়েছি, তিনি সেখানে দোয়াও করেছেন। তিনি খুবই পরিশ্রমী মুবাল্লেগ ছিলেন। রোগের ভয়াবহতা সত্ত্বেও তিনি কখনো মনোবল হারান নি আর তার ওপর জামা'তের যে কাজই ন্যাস্ত হতো তিনি তা সুচারুরূপে সম্পাদন করতেন। তেমনিভাবে অপর এক মুরব্বী সাজেদ সাহেব লিখেন, জ্যেষ্ঠ মুরব্বী হওয়া সত্ত্বেও তবলীগি বিষয়াদিতে কনিষ্ঠদের মতামত নিতে কখনো দ্বিধা করতেন না। খুবই বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। মরহুম খুবই দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী ছিলেন। গত বছর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন কিন্তু কিছুটা সুস্থ হতেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় যোগদানের জন্য পৌঁছে যান।

বাসোকী সাহেব লিখেন, মিশনহাউজ অফিসে যখন আমার পদায়ন হয় (অর্থাৎ শেষ তিন বছর তিনি মুবাল্লেগ ইনচার্জ ছিলেন) তখন তবলিগী অনুষ্ঠানাদির সুবাদে মাঠপর্যায়ে কর্মরত মুবাল্লেগদের সাথে যোগাযোগ হয়। তখন আমি লক্ষ্য করলাম, তবলিগী প্রোগ্রাম প্রস্তুত বা প্রণয়নে মরহুম চমৎকারভাবে কাজ করতেন। তবলিগী অনুষ্ঠানগুলোকে সফল করার জন্য দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ এবং স্থানীয় মুবাল্লেগদের ব্যবস্থাপনা খুবই সুচারুরূপে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতেন। আমাকে সর্বদা বলতেন, বয়আতের সংখ্যা হালনাগাদ বা আপডেট করতে থাকা উচিত যেন রিজিয়নে কর্মরত দাঈয়ানে ইলাল্লাহদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটিই নিয়ম, অর্থাৎ বয়আতের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, দাঈয়ানে ইলাল্লাকে অবগত রাখা উচিত আর তাদের কাছ থেকে খবরাখবরও নেয়া উচিত। এতে করে দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্রা সক্রিয় থাকে এবং নও মোবাঈনদের ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়।

মুরব্বী সারমাদ সাহেব বলেন, মরহুম তবলীগি কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের একটি বিশেষ প্রেরণা ও উচ্ছ্বাস রাখতেন। আমরা যখন উত্তর সুমাত্রার বন্তপানে থেকে শুরু করে প্রাদেশিক সীমান্তবর্তী অঞ্চল সোসা পর্যন্ত তবলীগের নতুন পথ উন্মোচনের পরিকল্পনা করছিলাম তখন তিনি খুব দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আশায় বুক বেঁধে বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও পরিকল্পনা হাতে নেন এবং আল্লাহ্র ফযলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেই অভিযান অব্যহত থাকে। পরবর্তীতে তহবিল-স্বল্পতার কারণে এটি বাধাগ্রস্ত হয়, কিন্তু তার এই অভিযানের সুফল প্রকাশ পায় এবং অধিকাংশ নও মোবাঈন উক্ত অঞ্চল থেকেই আসে। তিনি সবসময় বলতেন, কখনো নিরাশ হবে না, কেননা আমাদের কাজ মূলত তবলীগ করা ও বীজ বপন করা। হতে পারে

ফসল কাটা ও ফল ঘরে তোলার সৌভাগ্য অন্য কারো হবে। যাহোক খুবই দৃঢ়সংকল্প এবং বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন।

আল্লাহ তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন। তিনি তার বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন এবং ওয়াক্‌ফের অঙ্গীকারও খুবই সুন্দরভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার মর্যাদা উন্নীত করুন। মরহুমের স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততিকে আল্লাহ্ আপন সুরক্ষার চাদরে আবৃত রাখুন এবং তিনি স্বয়ং তাদের অভিভাবক হোন।

দ্বিতীয় যে মরহুমের আমি স্মৃতিচারণ করবো তিনি হলেন, ইসলামাবাদের ডাক্তার পীর মুহাম্মদ নকীউদ্দীন সাহেব। তিনি গত ১৮ এপ্রিল ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মৃত্যুর সপ্তাহ-দশদিন পূর্বে সাম্প্রতিককালে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের বিভিন্ন লক্ষণ তার মাঝে প্রকাশ পেতে শুরু করে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রথমদিকে তার স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটছিল, কিন্তু গত ১৮ এপ্রিল স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং তাকে আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে প্রায় সন্ধ্যার দিকে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে মরুহুম স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র ও চার কন্যা রেখে গেছেন, তারা সকলেই বিবাহিত এবং নিজ নিজ সংসারে সুখে আছেন। মরহুম পীর মুহাম্মদ নকীউদ্দীন সাহেবের পিতা ও মাতা উভয়ের পরিবারের সকলেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের বংশধর ছিলেন। তার বংশবৃক্ষ হযরত সূফী আহমদ জান সাহেব পর্যন্ত পৌঁছে। তার দাদা হযরত পীর মাযহারুল হক সাহেব এবং নানা হযরত মাস্টার নযীর হোসেন সাহেব– উভয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হবার সম্মান লাভ করেছেন। হযরত পীর মাযহারুল হক সাহেব কাদিয়ানের মাদ্রাসা আহমদীয়ায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সহপাঠী হওয়ারও সম্মান রাখতেন। তারা অর্থাৎ পীর মাযহারুল হক সাহেবরা শৈশবে লুধিয়ানা থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে আসেন এবং প্রায় ছয় মাস পর্যন্ত প্রায় সময় হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাড়িতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সাহেবের মাতা হাকীম মুহাম্মদ হোসেন 'মরহমে ঈসা' সাহেবের পৌত্রি ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভাগের সময় ডাক্তার পীর মুহাম্মদ নকীউদ্দীন সাহেবের বয়স ছিল প্রায় এক বছর। অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে তার জন্ম হয়েছে, এই হিসেবে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৪ বছর; তিনি পরিবারের সাথে কাদিয়ান থেকে হিজরত করে প্রথমে লাহোরে আসেন, পরবর্তীতে ভেহাড়ি জেলার মেলসিতে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭০ সালে নিশতার মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৭৫/৭৬ সনে ইসলামাবাদে স্থানান্তরিত হয়ে যান। পরবর্তীতে এখানে সরকারি পলিক্লিনিক হাসপাতালে চাকরি পান। এখানে দীর্ঘদিন সেবা প্রদানের পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইরানে চলে যান, সেখানে দু'তিন বছর কাজ করেন। এরপর পাকিস্তান ফিরে আসেন; এখানে ইসলামাবাদে নিজের ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে নিজের ক্লিনিক পরিচালনা করে আসছিলেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তা অত্যন্ত সফল ছিল, দরিদ্রদের অনেক সেবা করতেন।

ইসলামাবাদ জামাতের আমীর ডাক্তার আব্দুল বারী সাহেব লিখেন, ডাক্তার পীর মুহাম্মদ নকীউদ্দীন সাহেব বিগত বারো বছরের অধিক কাল ধরে আহমদীয়া জামা'ত, ইসলামাবাদে কাযী-র দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি সবসময় কুরআন ও সুন্নতের আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন, যা বিবদমান উভয় পক্ষের জন্য পরম স্বস্তির কারণ হতো। অত্যন্ত সদাচারী, মিশুক, স্নেহবৎসল, গরীবের বন্ধু এবং সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন;

সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। পেশাগতভাবে যেহেতু ডাক্তার ছিলেন, তাই দিন-রাত খোদার সৃষ্টির সেবা তথা মানবসেবায় অগ্রগামী থাকতেন। জামা'তের দরিদ্র ও অভাবী রোগীদের জন্য তার ক্লিনিকের দ্বার সবসময় খোলা থাকত, আর তিনি অধিকাংশ সময়ই বিনামূল্যে সবাইকে সেবা প্রদান করতেন। কেবল জামা'তের-ই নয়, অ-আহমদীদের জন্যও তার মন ও ক্লিনিকের দুয়ার সদা-উন্মুক্ত ছিল; এক মানবহিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তার বন্ধুত্বের গণ্ডি অনেক বিস্তৃত ছিল এবং তাতে বেশ বড় সংখ্যক অ-আহমদীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে বাকপটুতা দান করেছিলেন, অ-আহমদী বন্ধুদেরকে তবলীগ করার কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না; আল্লাহ্‌র কৃপায় এরূপ (অর্থাৎ প্রতিকুল) পরিস্থিতি সত্ত্বেও তবলীগ করতেন। ডাক্তার সাহেব তাকে বলেন, যখন ১৯৭০ সালে আমি এমবিবিএস পরীক্ষা পাস করি, তখন আমি রাবওয়ায় আমার দাদা হযরত পীর মাযহারুল হক সাহেবের কাছে যাই এবং তাকে এই সুসংবাদ দিই যে, আমি আমার বংশের প্রথম যুবক, যে ডাক্তারী পাশ করেছে। আমার দাদা খুবই আনন্দিত হন এবং অন্যান্য উপদেশ প্রদানের পাশাপাশি এ উপদেশও দেন যে, নিজের রোগীদের ঔষধ দেয়ার পাশাপাশি তাদের জন্য দোয়াও করবে, কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, যে চিকিৎসক তার রোগীদের জন্য দোয়া করে না আর কেবল নিজের চিকিৎসার ওপরই নির্ভর করে, সে প্রকৃতপক্ষে শির্‌ক করে। ডাক্তার নকীউদ্দীন সাহেব বলতেন, ডাক্তারি পেশায় আমার পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল, আর এই পঞ্চাশ বছর যাবত আমি আমার দাদার নসীহত মেনে রোগীদের স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা দেয়ার পাশাপাশি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করি, বরং প্রতিদিন বিনা ব্যতিক্রমে দুই রাকা'ত নফল নামায পড়ে তাদের জন্য দোয়াও করে থাকি। এই রীতিই আমাদের সব ডাক্তারের অবলম্বন করা উচিত। শুধু পেশাগত দক্ষতা এবং ঔষধের ওপরই নির্ভর করবেন না, শুধু ঔষধের ওপর যেন বিশ্বাস না থাকে, বরং চিকিৎসার পাশাপাশি যেখানে রোগীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন সেখানে তাদের জন্য দোয়া করাও নিশ্চিত করুন। আর যদি নফল নামায পড়েন তবে তা খুবই উত্তম।

তার স্ত্রী উযমা নকী সাহেবা বলেন, আমার স্বামী খুবই নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত প্রাণ আহমদী ছিলেন। ধর্মের তবলীগ করার গভীর উন্মাদনা ছিল তাঁর মাঝে। তিনি অনেক বয়আতও করিয়েছেন এবং অনেক মানুষকে আহমদীয়াতের সত্যতা মানিয়েছেন। ভয় কিংবা অন্য কোন কারণে অনেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করে না, কিন্তু তিনি কমপক্ষে তাদেরকে আহমদীয়াতের সত্যতা মানতে বাধ্য করেছেন এবং তাদেরকে নির্বাক করে দিয়েছেন। এরপর অবশ্য তাদের সাথে সুসম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার স্ত্রীও একই কথা লিখেন যে, রোগীদের জন্য তিনি সবসময় দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন। আরো লিখেন যে, রোগীদের জন্য তার ভালোবাসার কারণে তিনি এই মহামারির সময়ও ক্লিনিকে যেতেন যে, কোথাও আমার রোগীরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে পড়ে। জ্বর আসার পরই কেবল ছুটি করেছেন। তিনি আরো লিখেন, রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসা প্রদান, তাদের খেয়াল রাখা এবং তাদের জন্য দোয়া করা এসব বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তিনি একজন অনুগত ছেলে, আদর্শ স্বামী, পরম স্নেহশীল পিতা এবং ভাইবোন ও বন্ধুদের প্রতি যত্নশীল একজন মানবহিতৈষি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জীবন্ত খোদার সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। দোয়ায় অনেক বেশি অভ্যস্ত ছিলেন আর চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী খোদা তার দোয়া শুনতেন। তার স্ত্রী বলেন, আমাদের এক মেয়ের ঘরে বিয়ের কয়েক বছর পরও কোন সন্তান হয় নি, তিনি তার জন্য অনেক দোয়া করতেন।

একবার আমরা তার বাড়িতে ছিলাম। ভোরবেলা তাহাজ্জুদের সময় কিংবা নামাযের সময় তিনি ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে একটু ঝুঁকলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এখানে বিছানার পাশে একটি শিশু ছিল অর্থাৎ দিব্যদর্শনে তিনি এটি দেখেন। এ সম্পর্কে আরো একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তিনি দিব্যদর্শনে বিছানার উপর একটি শিশু দেখতে পান এবং বলেন, আমার মনে হলো, শিশুটির পড়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে তাই আমি তাকে ধরার জন্য ঝুঁকলাম। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন এবং তার এই মেয়ের ঘরে এক পুত্র সন্তান দান করেন অথচ ডাক্তাররা এ ব্যাপারে খুব বেশি আশাবাদী ছিল না। আল্লাহ্ তা'লা এই ছেলেকে পুণ্যবান করুন এবং ধর্মের সেবা করার তৌফীক দান করুন। তার ভাগ্নে ও জামাতা আরশাদ এজায সাহেব বলেন, মরহুম সম্পর্কের দিক থেকে আমার সবচেয়ে বড় মামা ছিলেন। এ কারণে যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, তার সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি এবং দেখেছি। তিনি অনেক দোয়া করতেন, গরীবদের প্রতি সহানুভূতিশীল, নিঃস্বার্থ, খুবই সূক্ষ্ম ও সুন্দর চিন্তাধারার মানুষ এবং জীবনের কঠিন সময়েও তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলীকে সামনে রাখতেন। যদি কখনো পারবারিক, জামা'তী কিংবা জাগতিক কোন বিষয়ে পরামর্শ নেবার প্রয়োজন হতো তখন আমার মাথায় নির্দ্বিধায় সর্বপ্রথম এটি আসতো যে, মামার কাছে গিয়ে পরামর্শ নেই। তিনি বলেন, মামার অর্থাৎ ডাক্তার সাহেবের আরেকটি দিব্যদর্শন ছিল এম.টি.এ সম্পর্কে যা হয়তো অন্য কারোও জানা থাকবে। সম্ভবত ২০১০ সালের ঘটনা, যখন নিদেনপক্ষে পাকিস্তানে আধুনিক টাচ মোবাইল সচরাচর দেখা যেত না। তিনি বলেন, আমি মামার কাছে বসে তার কথা শুনছিলাম। তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, আযান সদৃশ কোন ঘোষণা হলো আর কিছু লোক তাদের পকেট থেকে কিছু বের করে নিজেদের কানে লাগাচ্ছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করার পর জানা গেল যে, খলীফাতুল মসীহ্র খুতবার সময় হয়েছে এবং সবাই লাইভ খুতবা শুনছে। এটি আজ আমরা প্রতি সপ্তাহেই পূর্ণ হতে দেখি।

তিনি আরো লিখেন, হযরত সুফি আহমদ জান সাহেবের বংশের সাথে সম্পর্ককে তিনি শুধু নিজের জন্য সম্মানের বিষয় বলে মনে করতেন না, বরং বংশের বাকী লোকদেরকে বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাথেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকতে হবে। শুধু কোন পুণ্যবান মানুষের বংশের সাথে সম্পর্ক থাকা কোন শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়; খোদার সাথে তোমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকাই হলো আসল বিষয়। দা'ওয়াত ইলাল্লাহ্ বা তবলীগের গভীর আগ্রহ রাখতেন বরং উন্মাদনা ছিল; ইনিও একই কথা লিখেছেন। আরো অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু সবকটি বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এটিই লিখেছেন যে, তিনি খুব সুন্দরভাবে কুরআনের দলীল-প্রমাণ মূলে দা'ওয়াত ইলাল্লাহ্ বা তবলীগ করতেন।

সালানা জলসার সময় বিশেষভাবে অ-আহমদী বন্ধুদের ঘরে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং সুস্বাদু খাবারের মাধ্যমে তাদের আপ্যায়ন করতেন। তাদেরকে জলসা শুনাতেন, এভাবে তবলীগের পথও খুলে যেত। তিনি বলেন, করোনা মহামারি দেখা দেয়ার পরও মামা ক্লিনিকে যাওয়া বন্ধ করেন নি। আমি কয়েকবার তাকে ফোনে বলেছি এবং বুঝানোর চেষ্টা করেছি যেন তিনি (ক্লিনিকে) না যান। তখন তিনি এটিই বলতেন যে, ডাক্তার ঘরে বসে গেলে রোগী কী করবে? এর পাশাপাশি বিভিন্ন যুক্তি দিতেন, যে কারণে আমি নিরুত্তর হয়ে যেতাম। চরম অসুস্থ অবস্থায়ও ক্লিনিকে যেতেন। সর্বদা এটিই বলতেন যে, আমরা সেবার জন্য এখানে আসি, এখানে একটি দায়িত্ব পালন করছি। শুধু অর্থ উপার্জন করা ক্লিনিকের উদ্দেশ্য নয়।

তার মেয়ে আয়েশা নূরুদ্দীন বলেন, আমার পিতা একজন অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়ালু ও দোয়ায় অভ্যস্ত পিতা ছিলেন। প্রতিটি বিষয়ে সর্বদা দোয়া করা ও আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উপদেশ দিতে থাকতেন। তিনি বলেন, যে কোন বিষয়ে তাকে দোয়ার জন্য বললে তিনি এটিই বলতেন যে, নিজেও দোয়া কর আর আমিও দোয়া করব। এরপর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা নিয়ে আমাদেরকে বলতেন যে, আমি এরূপ স্বপ্ন দেখেছি বা আল্লাহ্ তা'লা এভাবে বলেছেন। পেশাগতভাবে হাজার হাজার লোকের চিকিৎসা করতেন, হাজার হাজার লোককে বিনামূলে চিকিৎসা সেবা দিতেন ও তাদের দেখাশোনাও করতেন। রোগীদের কাছ থেকে এত কম ফিস নিতেন যে, তার অধিকাংশ রোগী গরীবরাই ছিল। তিনি আরো লিখেন, আমার পিতা একজন জীবন্ত কুরআন ছিলেন। যে কোন বিষয়ে কুরআনের পথনির্দেশনা নেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে কুরআনের আয়াত মুখস্ত পাঠ করতেন, এরপর অনুবাদ বলে বিষয়টি বিস্তারিত বুঝাতেন। খিলাফতের সাথে এত গভীর ভালোবাসা ছিল যে, এম টি এ-তে এক ঘন্টার খুতবা সম্প্রচার আরম্ভ হতেই তিনি সাথে সাথে ঘরে ডিশ লাগানোর ব্যবস্থা করেন যেন এম টি এ দেখার জন্য লোকেরা আমাদের ঘরে আসে। খিলাফতের প্রতি এ ভালোবাসার কারণে সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণ বেশ ক'জন অ-আহমদীকে ডেকে শুনাতেন। তাদেরকে বয়াআত অনুষ্ঠানের পুরো কার্যক্রম দেখাতেন। জলসার কার্যক্রম দেখানোর পাশাপাশি খাবারেরও ভালো ব্যবস্থা করতেন আর বলতেন এরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমান।

তার কন্যা ওয়ারদাহ্ বলেন, শৈশব থেকেই আমাদেরকে নামায পড়া, কুরআন পাঠ, রোযা রাখা, সময়মতো চাঁদা পরিশোধ করা ও সদকা-খয়রাত করায় অভ্যস্ত করেন। আমাদের ভাই বোনদের বিয়ে দেয়ার সময় শুধুমাত্র ধর্ম দেখেছেন। কখনো পার্থিব বিষয়াদির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। আমাদেরকে শৈশব থেকেই এটি শিখিয়েছেন যে, সব বাসনা তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ণ হয় না। এজন্য সর্বদা ধৈর্য্য অবলম্বন ও দোয়া করতে হয়।

তার জামাতা আব্দুল কুদ্দুস সাহেব বলেন, এই অধমের সাথে শ্বশুরের সম্পর্ক ছিল পিতাপুত্রের মতো। তিনি বলেন, তার কাছ থেকে নতুন কোন কথা, কোন আয়াতের ব্যাখ্যা অথবা কোন বিতর্কিত বিষয়ে নতুন আঙ্গিকে কিছু শেখার সুযোগ হবে, এজন্য আমি সবসময় তার সাথে সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হয়ে থাকতাম। তিনি বলেন, আমার বিয়ের পরে প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে যেতে আমি স্বাচ্ছন্দবোধ করতাম না; তিনি এমনভাবে আপন করে নিয়েছেন যে, দ্বিধাদ্বন্দ দূর হয়ে যায় এরপর তিনি লিখেন, কোন জাগতিক বিষয়, রাজনীতি, ফ্যাশন এবং যুগের স্রোতে তার কোন আগ্রহ ছিল না। ইবাদত, কুরআন, ধর্মীয় জ্ঞান এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বিষয়াবলী তার একান্ত পছন্দনীয় বিষয় ছিল। বিদআতের বিরুদ্ধে এমন এক পাহাড় ছিলেন যাকে কেউ সরাতে পারতো না। তিনি বিয়ে ইত্যাদির সময় কুপ্রথাকে কঠোরভাবে দমন করেছেন। মেয়েরা এমন কোন গান গাইলে যাতে শিরকের চিহ্নমাত্র থাকত তিনি তৎক্ষণাৎ বাধা দিতেন, বরং অত্যন্ত কঠোরভাবে থামাতেন।

একইভাবে তার মেয়ে কুররাতুল আয়েন হাদিয়া লিখেন, তিনি আমাদের নসীহত করে বলেছেন যে, কারো বিরুদ্ধে কখনো মনে কথা পুষে রাখবে না। নিজের শ্বশুরবাড়ির লোকদেরকে আপন মনে করবে; কাউকে নিজের কথা বা কর্ম দ্বারা কষ্ট দিবে না। এরপর তিনি নিজের মেয়েকে এ কথাও বলেছেন যে, কোন ভালো মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা কোন বড় বিষয় নয়। কাজের কথা হলো, খারাপ মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা। এটিই

ইসলামের শিক্ষা। বর্তমান যুগে এ সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বলেছেন যে, এটি সেই জিনিস, এটিই সেই উন্নত নৈতিক চরিত্র যা অন্যদেরকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তোমাদের দিকে টেনে আনবে। এরপর তিনি বলেন, বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও বড় পাপ, তাই বিশৃঙ্খলা রোধ করতে সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয় অবলম্বন কর। এ মহান উপদেশই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দিয়েছেন। পিতামাতারা যদি এই নসীহতই সন্তানদেরকে করতে থাকেন তাহলে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে।

তার পুত্র পীর মুহিউদ্দীন সাহেব বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) আমাদের ঘরের লাউঞ্জে বসে দরস দিচ্ছেন, আমিও সেখানে বসে আছি, আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, এটা ঘর নয় বরং 'দ্বার' (বহু কক্ষবিশিষ্ট বড় ঘর)। এ থেকে তোমরা কল্যাণ লাভ করে থাক। এ 'দ্বার' কখনো পরিত্যাগ করো না। আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, তোমার পিতা ওলীআল্লাহ্। পুনরায় বলেন নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমার পিতা ওলীআল্লাহ্। দরিদ্রদের প্রতি তিনি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। অনেক পরিবারের মাসিক রেশন এবং শিশুদের পড়াশোনা, ঔষধ এবং চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিদিন পঞ্চাশ শতাংশের বেশি রোগীকে বিনামূল্যে দেখতেন। একইভাবে তার জামাতা আব্দুস সামাদ সাহেব বর্ণনা করেন, কুরআন করীমের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। যখন কোন বিষয়ে কথা বলতে হতো অবশ্যই কুরআনের আয়াত পাঠ করে এরপর তার অনুবাদ উপস্থাপন করতেন। অ-আহমদীদের সাথে কথোপকথনের সময় যদি কেউ বলত যে, মির্যা গোলাম আহমদের কোন নিদর্শন দেখাও; তখন তিনি বলতেন, আমি নিজেই নিদর্শন। তিনি একজন আদর্শ আহমদী ছিলেন। নিজ জামা'তের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে প্রত্যাশা ছিল তিনি তার সঠিক প্রতিচ্ছবি বা সত্যায়নস্থল ছিলেন। তার ব্যক্তিত্বের অনন্য বৈশিষ্ট ছিল যে, তার সাথে সাক্ষাৎকারী সবার প্রকৃতিতে পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যেত। এটাই একজন পুণ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে যে, তার সান্নিধ্যে যারা বসে তারাও পুণ্যবান হয়ে যায়। আর এটি কোন কথার কথা ছিল না যে 'আমি নিদর্শন'। কিছু অ-আহমদী কখনো কখনো এটিকে ঠাট্টা মনে করে, তিনি বলতেন ঠাট্টা করছি না বরং সত্যিই তা-ই; আর যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে অন্যদেরকে মানতে বাধ্য করতেন যে, আহমদী হিসেবে যারা সঠিকভাবে শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক জীবন্ত নিদর্শন ও মু'জিযা। সুতরাং এটিই সেই মান, যা প্রত্যেক আহমদীর অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। পুরোনো নিদর্শন সন্ধান করার পরিবর্তে স্বয়ং এক নিদর্শন হয়ে যাও।

অনুরূপভাবে ইসলামাবাদের নায়েব আমীর আব্দুর রউফ সাহেব বলেন, আমাকে বেশ কয়েক জন বলেছেন যে, আমরা তো অন্য কোন ডাক্তারকে চিনিই না; এখন আমরা কী করব! জামা'তের অনেক এমন দরিদ্র বন্ধু রয়েছে যাদের চিকিৎসা নিয়ে কোন অসুবিধাই হয় নি। তারা নির্দ্বিধায় ডাক্তার নকী সাহেবের ক্লিনিকে চলে আসতেন; সেখানেই চিকিৎসা করাতেন। অনেক অ-আহমদী বন্ধুরাও জানিয়েছেন যে, তিনি আমাদের পরিবারের গুরুজন ছিলেন। আমরা তাঁর পরামর্শ ছাড়া কোন কিছুই করতাম না। শুধুমাত্র আহমদীরাই নন বরং অ-আহমদীরাও তাঁর সাথে পরামর্শ করত। অনেক অ-আহমদী পরিবারের পারিবারিক কলহ-বিবাদও ডাক্তার সাহেবই সমাধা করতেন। কেননা যে স্থানে তাদের ক্লিনিকটি অবস্থিত সেখানে প্রায় চল্লিশ বছরের অধিক কাল যাবৎ তার এই ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে পিতা

আসত পরবর্তীতে তাদের সন্তানসন্ততি আসা আরম্ভ করেছে। তিনি অর্থাৎ নায়েব আমীর সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেব অনেকের ঘটনা আমাকে শুনিয়েছেন। কোন কোন অ-আহমদী তাদের সন্তানদের এই উপদেশ দিয়ে মৃত্যু বরণ করত যে, নিজেদের মাঝে কোন মতভেদ কিংবা বিবাদ বা বিতণ্ডা হলে ডাক্তার নকী সাহেবের সাথে অবশ্যই পরামর্শ করবে।

অতঃপর তিনি লিখেন, গত বছর ২০১৯ সালের জুন মাসের শেষ শুক্রবারে জুমু'আর নামাযের পর তিনি আমার দপ্তরে আসেন। দরজা বন্ধ করে বলেন, তোমাকে একটি কথা শুনাতে চাই আর একথা শুধুমাত্র আমার স্ত্রী-ই জানে। চার দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি, রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি যেখানে সর্বত্র মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে। আমি এই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হলাম না– একথা চিন্তা করতেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আওয়াজ কানে আসে যে, যে ব্যক্তি পাঁচটি আঘাত পাবে সে শহীদ। তিনি বলেন, আমি পিছন ফিরে দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উঁচু একটি স্থানে এক সেনাপতির ন্যায় দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, আমি আমার ক্ষতস্থান গুণতে আরম্ভ করি; আমি লক্ষ্য করলাম, তিনটি যখম বেশ গভীর ছিল আর এক পায়ে সামান্য আঁচড় লেগেছিল। আমি অজস্র ধারায় ইস্তেগফার করা আরম্ভ করি। এরপর আমার ঘুম ভেঙে যায় আর আমি ভাবতে লাগলাম, এর অর্থ কী হতে পারে। তিনি বর্ণনা করেন, এরপর চাঁদার প্রতি গভীরভাবে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় যে, চাঁদার হিসাব করা উচিত। তিনি বলেন, আমি হয়ত আলস্য দেখিয়েছে; পরবর্তী দিন ফজর নামাযের জন্য যখন আমি উঠলাম তখন আমার আক্ষেপ হলো যে, আমি এখনো হিসাব করি নি। তিনি বলেন, সকাল সকাল গিয়েই আমি হিসাব করলাম। দেখলাম যে, আসলেই কিছু টাকা হিসেবের বাইরে ছিল। তিনি বলেন আমি আজ দশ লক্ষ টাকার চেক সেক্রেটারী মাল সাহেবকে হস্তান্তর করেছি আর বলেন, সেদিন থেকে আমি অনেক ইস্তেগফার করছি।

তার ভাগ্নে অ্যাডভোকেট মুজীবুর রহমান সাহেবের পুত্র আযীযুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন, বেশ কয়েকবার তার কাছে তার শৈশবের ও জীবনের ঘটনাবলি শুনেছি। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহে এবং পিতামাতার দোয়ায় ডাক্তার হয়েছেন। তিনি বলতেন, তিনি এমন সময়ও দেখেছেন যখন কাগজ কেনারও টাকা ছিল না। কাজ করার জন্য ব্যবহৃত খাম একত্রিত করে সেগুলো খুলে তাতে নোট নিতেন। এভাবেই নিজের গ্রামে যে স্কুলে পড়তেন সেখানে গণিতের শিক্ষক ছিল না। তাই অন্য গ্রামে গিয়ে সেখানকার শিক্ষকের কাছে গণিত শিখতেন। তারপর নিজ গ্রামে এসে অন্যদের ও সহপাঠীদেরকে পড়াতেন।

তিনি তার নিয়মিত নামায পড়ার বিষয়ে বলেন, ছোটবেলায় একদিন তিনি এবং তাঁর সহোদর বোন খেলতে খেলতে এশার নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়েন। কিভাবে সময়মতো নামায পড়ায় অভ্যস্ত হয়েছেন সেটা বেশ মজার ঘটনা। মা যখন জিজ্ঞেস করেন, নামায পড়েছ? শৈশব ছিল, তারা ঘুমের ঘোরেই বলে ফেলেন, হ্যাঁ, পড়েছি। তিনি বলেন, মাঝ রাতে তার অর্থাৎ ডাক্তার সাহেবের মা এসে জাগান আর তিনি কাঁদছিলেন। তিনি বলেন, তুমি আমাকে নামায সম্পর্কে মিথ্যা বলেছ যে, তুমি নামায পড়েছ। খোদা তা'লা কাশফে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি নামায পড় নি। তিনি বলেন, সে দিনের পর থেকে আমি কখনোই নামায ছাড়ি নি। সুতরাং এ ছিল অবস্থা আর আহমদী মায়েদের অবস্থাও এমনই হওয়া উচিত। সন্তানদের সুশিক্ষা ও নামাযের চিন্তা ছিল এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। যখন

ব্যাথাতুর হৃদয়ে দোয়া করেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে দৃশ্যও দেখিয়ে দেন যে, আচ্ছা! প্রকৃত চিত্র হলো, তোমার সন্তানেরা নামায পড়ে নি। তাদের উঠাও। এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে সন্তানদের ঘুম থেকে জাগান। তিনি বলেন, এর এতটাই প্রভাব পড়ে যে, এরপর সারাজীবন আমি কখনোই নামায ছাড়ি নি। অধিকাংশ কথার বরাত কুরআন হতেই টানতেন। তিনি বলতেন, যদি খোদা তা'লার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন না হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আতের দায়িত্ব পালন হয় না। কেননা, হুযূর (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হলো, খোদা তা'লার সাথে বান্দার জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন।

অনুরূপভাবে ডাক্তার আতাউর রহমান সাহেব, তিনিও তার ভাগ্নে, তিনি বলেন, কুরআন করীম নিয়ে গভীর প্রণিধান করতেন এবং কুরআনের গভীর জ্ঞান রাখতেন। অধিকাংশ দীর্ঘ আয়াত তার মুখস্থ ছিল। পাকিস্তানে বিরাজমান বর্তমান পরিস্থিতি সত্ত্বেও কট্টর বিরোধীদেরকে নিজের ঘরে দাওয়াত দিয়ে জলসার কার্যক্রম ও খুতবা শোনাতেন। তার তবলীগে বেশিরভাগ লোক প্রভাবিত হতো এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি বয়'আতও হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জনাব গোলাম মুস্তফা সাহেবের, যিনি লন্ডনে থাকতেন। অতঃপর এখানে টিলফোর্ডে স্থানান্তরিত হন। প্রাইভেট সেক্রেটারী ইউ.কে-এর দপ্তরে স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন। গত ২৫ এপ্রিল ৬৯ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

১৯৮২ সনে তৃতীয় খলীফার যুগে তিনি বয়আত করেছিলেন আর ১৯৮৬ সনে তিনি লন্ডনে আসেন এবং মসজিদে অবস্থান করেন। আসতেই তিনি ওয়াক্ফের জন্য আবেদন করেন। যেহেতু তার পড়ালেখা খুবই কম ছিল সেজন্য হয়ত তার ওয়াক্ফ গৃহীত হয় নি, কিন্তু তিনি একজন ওয়াক্ফে জিন্দেগীর ন্যায়ই কাজ করা অব্যাহত রাখেন। প্রথমে পাকশালায়, পরবর্তীতে দপ্তরে। আল্লাহ্ তা'লাও তার ব্যবসাবাণিজ্য বিস্তৃত করেন, তার প্রতি কৃপা করেন। তিনি রিক্তহস্ত ছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করেন আর কিছু সম্পত্তি ক্রয় করার সৌভাগ্য হয়। পরবর্তীতে আরো সম্পত্তি গড়ার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা এত আশিসমণ্ডিত করেন যা তিনি দরিদ্রদের জন্যও ব্যয় করেছেন আর জামা'তের জন্যও ব্যয় করেছেন। কিন্তু ওয়াক্ফে জিন্দেগীর ন্যায় আমার সময়ে তিনি কীভাবে কাজ করেন তা বলছিলাম, যখনই কোন ব্যবসায়িক কাজে দপ্তর থেকে কোথাও যেতেন, দেশের বাহিরে যদি যেতে হতো অথবা ছুটি করতে হতো দীর্ঘদিন দপ্তরে আসা সম্ভব না হতো, সেক্ষেত্রে সবসময় রীতিমতো ছুটি নিতেন যে, আমার ছুটি প্রয়োজন, কেননা আমি অমুক জায়গায় যাচ্ছি; , চতুর্থ খলীফার যুগেও হয়ত এটিই তার রীতি ছিল। একজন ওয়াক্ফে জিন্দেগীর ন্যায় তিনি কাজ করেছেন এবং বলতেন, আমি ওয়াক্ফ নই ঠিকই, কিন্তু আমি নিজেকে ওয়াক্ফে জিন্দেগী মনে করি। যাহোক ওয়াক্ফে জিন্দেগীর অঙ্গীকার, যা তিনি নিজের সঙ্গে এবং আল্লাহ্র সঙ্গে করেছিলেন, তা অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণ করেছেন; রীতিমতো ওয়াক্ফে জিন্দেগী হোন বা না হোন।

প্রাথমিক পর্যায়ে মসজিদে অবস্থানকালে কেউ তাকে হোটেলে চাকরি করার জন্য পাঠিয়েছিল। সেখানে তিনি ওয়েটারের চাকরি পান। এই চাকরি তার ভালো লাগে নি। তাই পরের দিনই সেই চাকরি ছেড়ে চলে আসেন আর বলেন- আমি ভাবলাম, এই কাজের চেয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গরখানার প্লেট ধুয়ে দেয়াই শ্রেয়– টাকাতো আমি এমনিতেই পাচ্ছি। অতঃপর ওয়ালী শাহ্ সাহেবের সাথে মসজিদ ফজলের পাকশালায় কাজ

শুরু করে দেন, এরপর বিশেষ নিরাপত্তা বিভাগেও কিছুদিন ডিউটি করেন। ১৯৯৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে পিএস দপ্তরে কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন আর সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত, যেমনটি আমি উল্লেখ করেছি, অত্যন্ত সুচারুরূপে তিনি তার দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মরহুম মুসীও ছিলেন। মরহুম মৃত্যুর সময় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে স্ত্রী ছাড়াও দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তান রেখে গেছেন।

তার স্ত্রী মাহমুদা মুস্তফা সাহেবা লিখেন আমার এবং মুস্তফা সাহেবের দাম্পত্য জীবন আনুমানিক ৩৪ বছরের। এই বছরগুলোর ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, তার প্রতিটি পদক্ষেপ খোদা তা'লার জন্য ছিল। তিনি বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, একজন নিষ্ঠাবান স্বামী, পিতা, ভাই এবং বন্ধু ছিলেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। অনেক দূরদর্শী এবং সবার জন্য উপকারী, নিঃস্বার্থ সেবক, সাহসী ও নির্ভীক মানুষ ছিলেন। খিলাফতের খাতিরে জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি যখন পাকিস্তানে বয়আত করি তখন নিজের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই যে, আমি সর্বদা খিলাফতের সান্নিধ্যে থাকব। সেই সময় তার কাছে কোন উপায়উপকরণ ছিল না, কিন্তু তিনি খোদা তা'লার কৃপায় সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা উপকরণও দিয়েছেন। আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে গভীর আগ্রহ লালন করতেন। তিনি বলেন, আমার মনে আছে আমার পুত্র জন্ম নিলে আমি তাঁকে বললাম আমার অর্ধেক অলঙ্কার জামা'তকে দিয়ে দিব বলে স্থির করেছি। একথা শোনামাত্রই তিনি উত্তর দেন যে, অর্ধেক কেন পুরোটা দাও। তিনি বলেন, প্রথম দিকের কথা, আফ্রিকায় মসজিদ নির্মাণের তাহরীক করা হয়। সেই সময় আমাদের কাছে ঘরও ছিল না, কিন্তু যা-ই অর্থ একত্র হতো তা মসজিদ খাতে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিতেন। নিজের জন্য খরচ করতে গিয়ে অতি সাবধানে খরচ করতেন, কিন্তু অন্যদের জন্য খরচ করতে হলে ভাবতেনও না। সর্বদা ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি একজন সত্যিকার মু'মিনের ন্যায় ধর্ম এবং জগৎ দুটোই অর্জন করেছেন। প্রত্যেক কাজে আমাকে সাথে রেখেছেন যেন সবকিছু আমার জানা থাকে আর প্রত্যেক বিষয়ে আমার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন।

এরপর বলেন, মোস্তফা সাহেব তার পরিবারের মধ্যে একমাত্র আহমদী ছিলেন। তিনি যখন বয়আত করেছিলেন তখন নিজের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, পৈত্রিক উত্তরাধিকার থেকে কোন কিছুই নেবেন না আর দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! যদি তোমার মসীহ্ সত্য হয় আর আমি সত্য বুঝেই বয়আত করেছি, তাহলে আমাকে যা দেওয়ার তোমার পক্ষ থেকেই দিও আর দুনিয়ার কারো মুখাপেক্ষী করো না। আল্লাহ্ তা'লা তার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন আর প্রমাণ করেছেন যে, তুমি বয়আতের যে পদক্ষেপ নিয়েছ তা সঠিক। আল্লাহ্ তা'লা বিভিন্নভাবে তাকে সাহায্যও করেছেন। তার নিজ গ্রামের লোকেরা কোন না কোন সময় আহমদী হবে– এ বিশ্বাস নিয়ে তিনি সেখানে বড় মসজিদ বানিয়েছেন। এছাড়া নিজ আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোনদের বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। তার স্ত্রী বলেন, নিজ দোয়া কবুলিয়তের ওপর তার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল আর এ সংক্রান্ত অনেক ঘটনা তিনি লিখেছেন। তার মেয়ে সওবিয়া মোস্তফা বলেন, আমার বাবার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'লার সত্তা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত-ব্যবস্থাকে ভালোবাসা। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অগাধ আস্থা ছিল, সব সময় আমাদের বলতেন যে, আমি অমুক সময় এই দোয়া করেছি যা এভাবে গৃহীত হয়েছে। তিনি সর্বদা খলীফাতুল মসীহ্র তাবাররুক হস্তগত করার চেষ্টা করতেন। কোন স্থান থেকে পেলে এ থেকে নিজের অংশ অবশ্যই সুরক্ষিত করে রাখতেন

এবং পরবর্তীতে অল্প অল্প করে লোকদের মাঝে বিতরণও করতেন যেন তারাও এ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে। তিনি জলসায় আগত মেহমানদের দেয়ার জন্যও তাবাররুক ঘরে জমা করতেন। তিনি বলেন, আমার পিতার অনেক পরিচিত লোকজন আমাকে ফোন করে বলেছেন যে, আজকে আমাদের মনে হচ্ছে আমরা আবার এতিম হয়ে গেলাম। তিনি দরিদ্রদের অনেক বেশি সাহায্য করতেন। তিনি আরও বলেন, লণ্ডন থাকাকালে যখন আমরা টুটিং থেকে গ্রেসেনহল রোডে স্থানান্তরিত হই তখন আমার পিতা যথাসাধ্য বড় ঘর নেয়ার চেষ্টা আরম্ভ করে দেন যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের পূর্ণমাত্রায় সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়। তিনি সবসময় বলতেন, কখনো বাড়ি নিলে খিলাফতের ছায়াতলেই (অর্থাৎ কেন্দ্রের নিকটেই) নিতে হবে, কখনো এখান থেকে দূরে যাওয়া যাবে না। তিনি লিখেন, আমার পিতা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সকলের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কেউ কোন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হলে সেই অবস্থার যাতে উত্তরণ ঘটে এর জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। তার অসুস্থ হওয়ার কয়েকদিন পূর্বেও তিনি আমাকে যে শেষ উপদেশ দিয়েছিলেন তা হলো, সর্বদা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে, নিয়মিত নামায ও কুরআন পাঠ করবে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তোমার সাথে থাকবেন। প্রথমে ছোট মেয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার বড় মেয়ে মাদীহা মুস্তফা লিখেন, যদিও আমার পিতা গ্রাম থেকে এসেছিলেন এবং তেমন শিক্ষিত ছিলেন না, তথাপি তার চিন্তাভাবনা ও দূরদর্শিতা এবং জীবনযাপনের রীতিনীতি অনেক শিক্ষিত লোকের চেয়েও তাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজকাল পৃথিবীতে এমন মানুষ অনেক কমই আছে যারা প্রকৃত অর্থেই পুরুষ ও নারীকে সমমর্যাদা প্রদান করে। তিনি তার কন্যাদের কখনোই বোঝা মনে করেন নি, বরং প্রায়শই বলতেন যে, যার কন্যা সন্তান হয়েছে সে পার পেয়ে গেছে, তার কাজ কর্মের দিন শেষ আর আরামের দিন শুরু। তিনি লিখেন, তার ছেলে মেয়ে উভয়েরই পড়াশোনা ও তরবীয়তের কাজটি তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে ও সমানভাবে সম্পন্ন করেছেন আর এতে কোন ত্রুটি করেন নি। তবে সন্তানদেরকে ভালোবাসা সত্ত্বেও আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দার প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কখনো ত্রুটি করেন নি। ঈদ হোক বা নিজের মেয়ের বিয়ে বা অন্য যে কোন কাজই হোক না কেন, তিনি নামায পড়া কখনো ছাড়েন নি। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার অগাধ আস্থা ছিল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তার কোন কাজ অসম্পন্ন থাকবে না। তবে তার কোন দুশ্চিন্তা থেকে থাকলে শুধু এই বিষয়ে ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লার উপাসনার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটির কারণে আবার আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন না হয়ে যান।

তার পুত্র সরফরাজ মাহমুদ বলেন, যখন আমরা টুটিং-এ বসবাস করতাম, তখনও নিয়মিত নামায আদায়ের জন্য মসজিদ ফযলে যেতেন। কখনো কোন নামায মসজিদে গিয়ে আদায় না করতে পারলে এটি নিশ্চিত করতেন যে, আমরা সবাই যেন ঘরে বাজামা'ত নামায আদায় করি। তিনি বলেন, আমাকে বলতেন, তুমি জীবনে যা অর্জন করতে চাও কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় খোদাই তোমাকে তা দিতে পারেন। যখন নামাযের সময় হতো তখন অন্য সকল কাজ ছেড়ে প্রথমে নামায আদায় করতেন। তার পুত্র বলেন, পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে নিয়মিত ফজরের নামাযে নিয়ে যেতেন। অধিকন্তু তিনি বলেন, তার দোয়ার কল্যাণই আমরা লাভ করছি। ফজরের নামাযের পর মসজিদ থেকে এসে দেখতেন যে, আমি মসজিদে গিয়েছিলাম কি না? কোন সময় অলসতা প্রদর্শন করলে বলতেন, আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা না করলে তোমারই ক্ষতি হবে। আল্লাহ্ তা'লার তোমার নামাযের প্রয়োজন

নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের জন্য নামায আদায় করে। তিনি বলেন, অসুস্থতার সময় আমরা যখন এম্বুলেন্স ডেকে পাঠাই তখন তাঁর নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তখনও শোয়া বা বসার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিলেন। হাসপাতালে যাওয়ার সময় যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন বারবার এটিই বলেছেন যে, সবসময় সময়মতো ও বাজামা'ত নামায আদায় করো।

ঘর যখন বড় ছিল তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মেহমানদের আতিথেয়তা করতেন। জলসার সময় চল্লিশ জনের মতো মেহমান থাকত তাতে। যখন মসজিদের কাছে বাড়ি নেয়া হয় তখন ঘর ছোট ছিল, সেখানেও পঁচিশ জনের সংকুলান হতো। এই ঘরেও পঁচিশ জন মেহমানের জায়গা হওয়া খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু তারপরও অনেক আনন্দের সাথে আতিথেয়তা করতেন। আমিও কয়েক বার তাকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, আমরা কোনভাবে থাকি আর ঘর মেহমানদেরকে দিয়ে দেই। তিনি সবসময় বলতেন, ধর্ম ও পার্থিবতা– উভয়টি সাথে নিয়ে সম্মুখে এগোতে হবে, কিন্তু একথা স্মরণ রেখ যে, এ কাজ সহজ নয়, জাগতিক কোন বিষয় যখনই সামনে আসে তখন ধর্মকে সর্বদা জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার দিবে– তিনি সর্বদা সন্তানদের এই উপদেশই দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাকে সর্বদা এই উপদেশ দিয়েছেন যে, আমাদের সবকিছু আল্লাহ্‌র জামা'তের আমানত, তাই আমাদের কাজ হলো এর সুরক্ষা করা আর এই উদ্দেশ্যে এ আমানতকে বর্ধিত করতে হবে যেন তা জামা'তের কাজে আসতে পারে। সর্বদা উপদেশ দিতেন যে, চাঁদা প্রদানে কখনো বিলম্ব করবে না। মাসের প্রথম দিনই তিনি নিজের চাঁদা পরিশোধ করতেন আর বলতেন, একথা মনে করো না যে, আমাদের চাঁদার জামা'তের প্রয়োজন আছে, বরং চাঁদা দেওয়ার ফলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নিয়ামতরাজিকে আকর্ষণ করতে পারব। তিনি বলেন, অসুস্থতার শেষ দিনগুলোতে যখন ভেন্টিলেটর লাগানো হয়, কোমা'য় যাবার পূর্বে (পরবর্তীতে কোমা'য় চলে গিয়েছিলেন) তিনি আমাকে শেষ যে কথা বলেছিলেন তা ছিল, সরফরাজ! আমি জানি যে, মাসের প্রথম দিন পার হয়ে গেছে, গিয়ে আমার আলমারীতে দেখ, সেখানে সব ফাইল-পত্র রাখা আছে, আমার চাঁদার হিসাব-নিকাশ লেখা আছে, আমার সম্পূর্ণ চাঁদা পরিশোধ কর। সর্বদা আমার উপদেশ স্মরণ রাখবে, প্রত্যেক মাসের প্রথম দিন সম্পূর্ণ চাঁদা পরিশোধ করবে আর এক্ষেত্রে কখনো বিলম্ব করবে না।

তার শ্বশুর কেরামত উল্লাহ্ সাহেব বলেন, স্নেহের মোস্তফা তার স্ত্রীর রক্তসম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের সাথে গভীর নিষ্ঠার সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করেছেন আর অধমকে তার আপন পিতার মর্যাদা দিয়েছেন। মোস্তফা সারা জীবন খোদা তা'লার ইবাদত আর খিলাফতের চরণে সেবা করে কাটিয়েছেন। একইভাবে তার জামাতা বেলাল সাহেব বলেন, কুরআনের বিভিন্ন দোয়া এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অমৃত বাণীর ফটোকপি সংগ্রহ করে আমাকে এবং তার সব সন্তান, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের দিতেন। আর বলতেন, এগুলো পাঠ কর আর কুরআনের দোয়াগুলো মুখস্ত কর। তিনি বলেন, আমি দেখেছি– মসজিদ ফযলে যে দরস দেওয়া হতো তার কপি সংগ্রহ করে তা বাড়িতে নিয়ে এসে পুনরায় পড়তেন আর সবাইকে পড়ার জন্য দিতেন, আর মুঠোফোনে সেগুলোর ছবি তুলে নিজের অন্যান্য অ-আহমদী ভাই-বোন এবং তাদের সন্তানদেরও প্রেরণ করতেন। এরপর তাদেরকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন যে, তারা পড়েছে কি-না? এভাবে তবলীগ করতেন। খুবই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। সাধারণ দিনগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই কাউকে না কাউকে অতিথি

হিসেবে বাসায় নিয়ে আসতেন আর জলসার দিনগুলোতে তো চব্বিশ ঘন্টা অতিথিদের যাতায়াত থাকতো। সবাইকে (তিনি) একথাই বলতেন যে, জিজ্ঞেস করার দরকার নেই, নিজের ঘর মনে করে এসে যেও।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের তিনি বিশেষভাবে অনেক অগ্রাধিকার দিতেন, সর্বদা বলতেন, আমার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। কেউ যদি একবার জলসার সময় তার বাসায় থাকার জন্য যেত আর পরের বছর অন্যত্র অবস্থান করত তাহলে খুবই চিন্তিত হতেন যে, আমার হয়ত কোন ভুল হয়ে গেছে, অতিথি সেবার কোন ঘাটতি থেকে গেছে, যে কারণে তিনি (এবার আর) আসেন নি। এরপর সুযোগ পেলে জোর করে তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসতেন। নিজের অন্যান্য জাগতিক কাজকর্ম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে এমনভাবে গুছিয়ে রেখেছিলেন যেন নামাযে কোন বিঘ্ন না ঘটে। কাজকর্ম বাদ দিয়ে মসজিদে পৌঁছে যেতেন।

একইভাবে তার স্ত্রীর ভাই সোহেল আহমদ চৌধুরী সাহেব বলেন, তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, তিনটি বিষয়ের প্রতি যার উন্মাদের মতো ভালোবাসা বা আকর্ষণ ছিল, প্রথমত ইবাদত, দ্বিতীয়ত খিলাফতের সাথে সম্পর্ক আর তৃতীয়ত অতিথিসেবা। মোস্তফা ভাইয়ের বাসাটি জলসার দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিতে পরিপূর্ণ একটি সরাইখানার দৃশ্য তুলে ধরত।

আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরের কর্মী আসলাম খালেদ সাহেব বলেন, দপ্তরে তার সাথে আমাদের নিত্যদিনের সম্পর্ক ছিল। অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন– নির্ভীক, পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, দরিদ্রদের লালনকারী, অতিথিপরায়ণ, চাঁদার ক্ষেত্রে অনন্য, সকল প্রকার পুণ্য কজের সুযোগ সন্ধান করতেন, দপ্তরে লোভীর ন্যায় সবার কাছ থেকে কাজ ছিনিয়ে নিয়ে নিজে করতে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তিনি বলতেন, এটিই আমার উপার্জন। আর সঠিকভাবে কাজ সম্পাদিত হলে আনন্দিত হতেন।

প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরের স্বেচ্ছসেবী কর্মী ফাহিম আহমদ ভাট্টি সাহেব বলেন, সম্ভবত ১৯৯২ সাল থেকে তিনি এই দপ্তরে কাজ করা আরম্ভ করেন। তখন কর্মচারীর স্বল্পতা ছিল। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতেন। একজন বিশ্বস্ত ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী ছিলেন। বহু গুণের আধার ছিলেন, যার মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, প্রিয় ও ঈর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল খিলাফতের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, আনুগত্য ও অনুগত থাকা আর ছোট ছোট বিষয়ে দিক-নির্দেশনা নেয়া। আল্লাহ্ তা'লা তাকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন– এর উল্লেখ করার সময় সর্বদা বলতেন যে, এই দপ্তরে কাজ করা এবং এই দ্বারের কল্যাণেই আমি সবকিছু পেয়েছি।

ডাক্তার তারেক বাজওয়া সাহেব বলেন, ১৯৮০/৮১ সন থেকে (তার সাথে) আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আহমদীয়াত গ্রহণ থেকে নিয়ে মৃত্যু বরণ পর্যন্ত তাকে অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। বহু গুণের আধার, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসাকারী এবং খিলাফতের প্রেমিক ছিলেন। সিন্ধু (প্রদেশে) এসে তার দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায় বসবাস আরম্ভ করেন, কেননা পাঞ্জাবে তার বিরুদ্ধে জমিজমার কারণে মামলা হয়। সেখানকার পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি এখানে আসেন। যাহোক, সেখানেই আহমদীয়াতের সাথে পরিচয় ঘটে। আর অনবরত তিন বছর পর্যন্ত তার সাথে তবলীগ চলতে থাকে। তখনও তিনি সেখানে তাদের অর্থাৎ আহমদীদের মসজিদে নিয়মিত আযান দিতে থাকেন, এই আগ্রহ তার শুরু থেকেই ছিল। অবশেষে তিনি একটি স্বপ্ন দেখার পর তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করেন। সেই

স্বপ্ন ছিল, ঘরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আসেন এবং মুচকি হেসে বলেন, দুই জন খোদ্দাম প্রয়োজন। এরপর সেলিম সাহেব ও তার অর্থাৎ মুস্তফা সাহেবের প্রতি ইশারা করে বলেন যে, তুমি আর তুমি চলে আস। এরপর তিনি বয়আত করেন। বয়আতের পূর্বেই তিনি জামা'তের ইজতেমা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতেন। বয়আতের পর তিনি নিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেন। মনোযোগের সাথে খুতবা এবং প্রশ্নোত্তর শুনতে শুনতে তার মাঝে এতটা আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি বলতেন, আমি একাই অ-আহমদী মৌলভীদের জন্য যথেষ্ট, আমার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। তিনি বেশ কয়েকবার ওমরাহ্ করার তৌফিক লাভ করেছেন। এরপর ২০১০ সনে আল্লাহ্ তা'লা তাকে হজ্জ করারও সৌভাগ্য প্রদান করেন। কাদিয়ানের প্রতিও তার ভালোবাসা ছিল। পূর্বে প্রায়-ই সেখানে যেতেন। মরকযে বা কেন্দ্রে ঘর নির্মাণের বাসনা ছিল। সেখানে ঘর বানিয়ে পরবর্তীতে তা জামা'তকে দান করে দেন।

ডাক্তার ইব্রাহীম নাসের ভাট্টি সাহেব তার চিকিৎসা করছিলেন, তিনি বলেন, গোলাম মুস্তফা সাহেবের সাথে আমার পরিচয় বেশি দিনের নয়। সর্বশেষ অসুস্থতার সময় কনসালটেন্ট হিসেবে তার দেখাশোনা করার সুযোগ হয়েছে। তিনি হাসপাতালে ডাক্তার ছিলেন আর ঘটনাচক্রে মুস্তফা সাহেব তার রোগী হয়ে আসেন। তিনি বলেন, তাকে শেষ অসুস্থতার সময় দেখার সুযোগ হয়েছে। এই সামান্য সময়ে কিছু এমন বিষয় নোট করেছি যা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, করোনা হামলার তীব্রতা সত্ত্বেও তিনি গভীরভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। আমার স্মরণ আছে, আমি তার কাছে গিয়ে তাকে সম্বোধন করে বলি, অসুস্থতার তীব্রতার কারণে হয়ত আরোগ্য লাভ সম্ভব হবে না। এটি শুনে মুস্তফা সাহেব কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকেন, এরপর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যা চান তাতেই আমি সন্তুষ্ট। তার চেহারায় দুঃখ এবং চিন্তার কোন লক্ষণ ছিল না, খুবই প্রশান্তচিত্ত ছিলেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হলো, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা। রোগের তীব্রতার কারণে আমাদের সি.পি.এ.সি. লাগানোর প্রয়োজন হতো। এটি অক্সিজেন দেয়ার জন্য খুবই কষ্টদায়ক একটি মেশিন, যা কখনো কখনো মানুষকে খুবই অস্থির করে তুলে আর কষ্টের কারণে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। মেশিন লাগানোর কারণে যখন তার কষ্ট আরম্ভ হতো তখন তার পরিবারের সদস্যরা এসে তাকে বলতো যে, যুগ খলীফার বার্তা হলো, (হুযূর বলছেন অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে তারা বলে যে, হুযূর বলেছেন) ডাক্তারদের নির্দেশনা পালন করুন। তিনি আমার এই বার্তা পেয়ে সহসাই শান্ত হয়ে যেতেন আর শান্তভাবে মেশিনকে সহ্য করতেন। তখন মনে হতো তার সাহস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেহে তাৎক্ষণিকভাবে বল ফিরে এসেছে। অনুরূপভাবে তিনি আরো বলেন, আমি দেখেছি যে, তিনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এজন্য খেতেন না যে, আরোগ্য লাভ হবে, বরং শুধু এজন্য খেতেন কেননা আমি তাকে ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব করেছিলাম। ডাক্তার সাহেব বলেন, খিলাফতের সাথে তার ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক এতটা অনন্য যে, আমি এতে মুগ্ধ না হয়ে পারি নি।

আল্লাহ্ তা'লা সকল মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন। যে বিশ্বস্ততা তারা খোদা তা'লা ও তাঁর ধর্মের প্রতি প্রদর্শন করেছেন আর যেভাবে তারা নিজেদের বয়আতের অঙ্গীকার পালনের চেষ্টা করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তার চেয়ে অধিক স্নেহ তাদের দান করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, এরা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের

সন্তানদেরও নিজ সুরক্ষাবেষ্টনীতে রাখুন, আর তাদের পুণ্যকর্মসমূহ ধারণ করার ও জারি রাখার তৌফিক দান করুন। তারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী হোক আর জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষাকারী হোক। আর তাদের পিতামাতা তাদের জন্য যে দোয়া করেছেন আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তাদের পক্ষে তা গ্রহণ করুন। (আমীন)